ড. কাজী দীন মুহম্মদ

জীবন ও সাহিত্য

ড. কাজী দীন মুহম্মদ
জীবন ও সাহিত্য

জুবাইর আহমদ আশরাফ

নাশাত

প্রকাশক
নাশাত পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১

প্রকাশকাল
জানুয়ারি, ২০২১
জামাদিউস সানি, ১৪৪২

© লেখক

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত

মূল্য : ২৬০ (দুইশ ষাট) টাকা মাত্র

Dr. Qazi Din Muhammad : Jibon o Shahitya. Writer : Jobair Ahmad Ashraf. Publish by nahsat Publication. Banglabazar, Dhaka. Price : 260 Taka. US$ 5 Dollars.

ISBN : 978-984-34-9559-4

দাদি সালেহা খাতুন
ও
নানি আমেনা খাতুন স্মরণে

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতমশ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স পাশ করেন। এ সময় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে অন্যতম শিক্ষক হিসাবে পান। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পরামর্শেই তিনি বাংলাভাষার ব্যাকরণ নিয়ে উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার লিঙ্গুইজটিক্স এন্ড ফনিটিক্স বিভাগে বাংলাভাষা নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় বাংলাভাষার ক্রিয়ার রূপভেদ বিশ্লেষণ ও সঠিক প্রয়োগ। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আগে বা পরে এরূপ ব্যাকরণিক গবেষণা দ্বিতীয় কেউ করেননি। এ ছাড়া তিনিই বাংলাসাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি অতুলনীয়। তাই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কালজয়ী ব্যাকরণবিদ ও ইতিহাসবিদ।

কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর কীর্তি অনুসারে উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। এর অন্যতম কারণ তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান। খাঁটি মুসলিমের স্বীকৃতিতে কার্পণ্য করা হয়। প্রকৃত মুসলিমের যথাযথ মূল্যায়ন হয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে।

তাঁর জীবনের বিশাল অংশ ব্যয় হয়েছে ইসলামী সাহিত্য রচনায়। তিনি অসাধারণ ও অনুকরণীয় গদ্যশৈলীর রূপকার। জাতীয় স্বার্থে তাঁর রচনা পঠিত ও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত তরুণপ্রজন্মের কাছে তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচিতি তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এ গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলো কাজী দীন মুহম্মদ স্যারের জীবদ্দশায় রচিত হয় এবং ঢাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। ছাপার পূর্বে ও পরে প্রতিটি লেখাই তিনি মনোযোগসহ পাঠ করেন এবং পরামর্শ দেন।

আমার দুর্লভ সৌভাগ্য যে, দীর্ঘ দিন তাঁর ন্যায় মহীরুহের সান্নিধ্য লাভ করেছি। একদিন তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে আপনি কয়টি প্রবন্ধ লিখেছেন? আমি বলি, সাত-আটটি হবে। তিনি বলেন, এগুলি রেখে দিবেন। আমার চলে যাওয়ার পর কাজে লাগতে পারে।

তরুণ প্রকাশক স্নেহভাজন মাওলানা আহসান ইলিয়াস অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে কামিয়াবি দান করুন। গ্রন্থখানি কম্পোজ করেছেন মাওলানা আকরাম হোসাইন। এ ছাড়া এ গ্রন্থের সঙ্গে যারা জড়িত সকলের জন্য রইল অশেষ মুবারকবাদ। আল্লাহ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

জুবাইর আহমদ আশরাফ

প্রথম ভাগ : জীবন

সংক্ষিপ্ত জীবন।। ১৩
বংশ।। ১৩
জন্ম ও মৃত্যু।। ১৫
আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ।। ১৫
দেশভ্রমণ।। ১৬
পুরস্কার ও সম্মাননা।। ১৬
শিক্ষা।। ১৬
লেখালেখি।। ১৮
কর্মজীবন।। ১৮
দায়িত্ব।। ১৯
কলাবাগান।। ২০
কাজী দীন মুহম্মদ : বিশ্বাসী কীর্তিমান মনীষী ও তাঁর ইসলামী সাহিত্য।। ২১
কাজী দীন মুহম্মদের ভাষাজ্ঞান।। ২৭
একজন ভাষাবিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে।। ৩৫
সাক্ষাৎকার।। ৪৪

দ্বিতীয় ভাগ : সাহিত্য

রচনা, প্রকাশকাল ও প্রকাশনী।। ৫৩
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ।। ৫৫
প্রথম খণ্ড।। ৫৬
দ্বিতীয় খণ্ড ।। ৬৫
তৃতীয় খণ্ড ।। ৭৭
চতুর্থ খণ্ড ।। ১০২
দি ভারবাল স্ট্রাকচার ইন কলোকুইয়েল বেঙ্গলি।। ১১৭
সাহিত্য সম্ভার ।। ১২০
সাহিত্য-শিল্প ।। ১৩৩
বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ ।। ১৪৪
ছোটদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।। ১৫০
আমি তো দিয়েছি তোমাকে কাউসার।। ১৫১
মানবজীবন।। ১৫২
জীবনসৌন্দর্য।। ১৫২
মানবমর্যাদা।। ১৫৩
শিশু-কিশোর রচনা।। ১৫৪

প্রথম ভাগ : জীবন

সংক্ষিপ্ত জীবন

বংশ

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের পিতার নাম কাজী আলীমুদ্দীন আহমদ এবং মাতার নাম মোসাম্মত কাওসার বেগম। দাদা কাজী গোলাম হোসাইন, দাদি মোসাম্মত রহিমা খাতুন। নানা মাওলানা শরাফতুল্লাহ চিশতী ও নানি মোসাম্মত সালেহা বেগম।

তাঁর পিতামহ কাজী গোলাম হোসাইন ছিলেন এলাকার বিখ্যাত আলেম। এ কাজী-পরিবারের অনেকের বহু কীর্তিগাথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য এলাকায় কিংবদন্তি হয়ে ছড়িয়ে আছে। এ বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ ইরান থেকে প্রথমে গৌড়, পাণ্ডুয়া ও পরে মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে রাজদরবারের পার্শ্বস্থ প্রধান মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁরই অধস্তন পুরুষ ছিলেন সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত হাকিমুল হুককাম কাজিউল কোজাত সিরাজুদদীন আল আদেল।

কাজী সিরাজ সর্বশাস্ত্রবিশারদ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শৈশবে তাঁর পিতামহ তাঁকে এই বলে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তোমাকে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী করুক এবং মানুষের খেদমতে তোমার জীবন নিয়োজিত হোক।

কাজী সিরাজ প্রধানবিচারপতি হিসেবে চাকরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে সোনারগাঁয়ে আসেন। তাঁর কাজী থাকাকালীন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এ অঞ্চলে লোকমুখে ও সাহিত্যে মশহুর হয়ে আছে।

তখন ছিল সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের শাসনকাল। সুলতান একদা শিকারে গিয়েছেন। ঘটনাচক্রে তাঁর তির শিকারের গায়ে না লেগে এক যুবকের গায়ে বিদ্ধ হয়। এতে সে মারা যায়। সেই যুবক ছিল এক বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বিধবা কান্নাকাটি করে কাজীর দরবারে গিয়ে নালিশ করলেন। কাজী মহামান্য সুলতানের বরাবরে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়ার ফরমান জারি করলেন।

সুলতান কিছুক্ষণ আগেই দরবার থেকে নিজ প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। ফরমান নিয়ে বাহক সুলতানের বাসস্থানে চলে গেল। সিংহদ্বার বন্ধ থাকায় বাহক কৌশলে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আযান দিতে শুরু করল। সুলতান অসময়ে আযান শুনে ব্যাপার কী জানতে চাইলেন। তখন বাহক

কাজীর ফরমান নিয়ে হাযির হল। সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ কালবিলম্ব না করে কাজীর দরবারে হাযির হলেন।

কাজী বিধবার যথাবিহিত ক্ষতিপূরণের জন্য বিধবার পক্ষে রায় দিলেন। সুলতান বিধবাকে খুশি করলেন এবং কাজী সিরাজুদদীনকে লক্ষ করে বললেন, আমি রাজ্যের মালিক বলে যদি আপনি ইনসাফ না করতেন, তবে এ তরবারির আঘাতে আপনার শির উড়িয়ে দিতাম। কাজীও দোররা বের করে বললেন, জাঁহাপনা, বিচার না মানলে এ দোররার আঘাত পড়তো আসামির পিঠে। ইনি সেই সিরাজুদদীন, যাঁর রক্ত ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের শিরায় প্রবাহিত।

সোনারগাঁওয়ের মগড়াপাড় থেকে পাঁচপীরের মাযারে যাওয়ার পথে এ ন্যায়বিচারক মহান কাজীর সমাধি বিদ্যমান। অযত্নে রক্ষিত সাদাসিধে এ কাজীর উপেক্ষিত মাযারটি দেখলে উপমহাদেশের আরেকটি অনুরূপ মাযারের কথা মনে পড়ে। সেটি মুঘল সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের মাযার। এত বড় ভূ-ভারতের সম্রাটপত্নী হয়েও তিনি নিজের সমাধি অত্যন্ত সাধারণভাবে রাখার নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁর নির্দেশমতো মাযারের গায়ে তাঁরই রচিত শ্লোক লেখা হয়েছে :

বর মাযারে মা গরীবে না চেরাগে না গুলে
না সদায়ে পরোয়ানা শুদে, না সদায়ে বুলবুলে॥
গরীব-গোরে দীপ দিও না, ফুল দিও না কেউ ভুলে
পতঙ্গ সব ধোকা না পায়, দাগা না পায় বুলবুলে।

এই সিরাজুদদীন সাহেবের পরবর্তী বংশধর পার্শ্ববর্তী মোয়াজ্জমপুর, বিক্রমপুরের কাজীকসবা, নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও ফারাজিকান্দা, রূপগঞ্জের রূপসী গ্রামে এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, কাটোয়া ও মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য জায়গায় বসতি স্থাপন করে বংশধারা রক্ষা করে চলেছেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মানসিংহ যখন পূর্ববঙ্গে আসেন তখন এই কাজীপরিবারের অনেকেই বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাংলার সুলতান বাহিনীর পক্ষে সংগ্রামে লিপ্ত হন।

এই বংশেরই কাজী জমিরুদ্দীন মোয়াজ্জমপুর থেকে সরে এসে শীতলক্ষ্যার পূর্ব তীরে রূপসী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের নাম অনুসারে এ পাড়ার নাম হয় কাজীপাড়া। এক সময় রূপসী গ্রামের কাজীদের সম্পদ ছিল, শিক্ষাদীক্ষা ছিল। দূরদূরান্ত থেকে আগ্রহী লোকেরা এখানে এসে পড়াশোনা করতেন এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে যেতেন।

আমাদের আলোচ্য পণ্ডিত ও মনীষী ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ রূপসীর এই কাজীপরিবারেরই অধস্তন বংশধর। তিনি পিতা ও পিতামহের দিক থেকে যেমন উত্তরাধিকারসূত্রে ইসলামচর্চার প্রেরণা পেয়েছেন, তেমনি মাতামহের পারিবারিকসূত্রেও অধ্যাত্ম সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছেন।

তাঁর পিতা কাজী আলীম উদ্দীন আহমদ ছিলেন দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট, যিনি প্রথম জীবনে রেঙ্গুনে এক বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। চাকরি-জীবন অসমাপ্ত রেখেই তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। এরপর আর ফিরে যাননি। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে দীন মুহম্মদ মেঝো। শিশু দীন মুহম্মদের বয়স যখন আট বছর পেরিয়ে ন'তে পড়েছে তখন তার পিতা ৪৫ বছর বয়সে মারা যান। সে সময়ে তাঁর মাতার বয়স ৩০-৩৫ বছর।

তাঁর মাতামহ মাওলানা শরাফতুল্লাহ চিশতী ছিলেন এই অঞ্চলের সম্মানিত পীর। তিনি সোনারগাঁয়ের পীর হিসেবে খ্যাত ছিলেন। জনাব শরাফতুল্লাহ ও তাঁর পূর্বপুরুষদের কর্মতৎপরতার কারণে সে এলাকার নাম হয় শরীয়তগঞ্জ। শরীয়তগঞ্জের এই চিশতী সাহেবের খানকার সঙ্গেই ছিল একমাত্র জুমআর ঘর। বুধ-বৃহস্পতিবার থেকেই দূরদূরান্তের মুসল্লিরা এসে এখানে মুসাফিরখানায় অপেক্ষা করতেন এবং জুমআর সালাত শেষ করে পরেরদিন যার যার বাড়ি ফিরে যেতেন। মাওলানা শরাফতুল্লাহ চিশতীর প্রচেষ্টায়ই এ এলাকায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

জন্ম ও মৃত্যু

কাজী দীন মুহম্মদ ১৯২৭ সনের পহেলা ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার রূপসী গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজীপরিবারে জন্মলাভ করেন।

তিনি ২০১১ সনের ২৮ অক্টোবর জুমআবার দিবাগত রাত পৌনে বারোটায় ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে ইনতেকাল করেন।

সে বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই দিন দুপুরে তাঁকে ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে বাদ মাগরিব ইবনে সিনা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সতেরোই সেপ্টেম্বর শনিবার ভর্তি করা হয় ল্যাবএইড হাসপাতালে। এ হাসপাতালে তিনি প্রায় বিয়াল্লিশ দিন ছিলেন। ২৯ অক্টোবর শনিবার বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রূপসীর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

চকিতে টুটিল তন্দ্রা-আলস, জাগিল মখলুকাত
বিস্ময়ে শুনে নির্মেঘ নভে সহসা বজ্রপাত।

আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ

1. Third Internation Congress for Classic Studies, London, 1958.
2. Asian Writers Conference, New Delhi, 1950.
3. Pakistan Lingustic Association, Lahore, 1964, 1965 & 1968.
4. International Islamic Conference, Colombo, 1978.
5. Internation Seminer, Iran, 1984.

দেশভ্রমণ

কাজী দীন মুহম্মদ একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদের পাশাপাশি ভ্রমণপিপাসুও ছিলেন। গোটা বাংলাদেশের নানা অঞ্চল তিনি ঘুরেছেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি লন্ডন যাওয়া ছাড়াও নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও বিশাল।

যেসব দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন : ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, জর্দান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিরিয়া, তুরস্ক, সাইপ্রাস, গ্রিস, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, আলজেরিয়া, মরক্কো, সুদান, মিসর, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, আমেরিকা, কানাডা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, কিউবা, রাশিয়া, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও আজারবাইজান।

পুরস্কার ও সম্মাননা

১. বাংলাদেশ দায়েমি কমপ্লেক্স পুরস্কার, ১৯৮৯

২. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ১৯৯০

৩. Distinguished Leadership Award, American Biographical Institute Publiched in 7th Edition of Biographical Encyclopedia.

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মাননা পুরস্কার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ২০০২

৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প স্বর্ণপদক, ২০০৩

শিক্ষা

শিশু কাজী দীন মুহম্মদের শিক্ষার সূচনা হয় তাঁর মায়ের কাছে। পরিবারের সংস্কৃতি অনুযায়ী সিপারা এবং কুরআনুল কারিম দিয়েই তাঁর শিক্ষার শুরু। পাঁচ বছর বয়সে বাড়ির অদূরে রূপসী বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির মাধ্যমে তাঁর আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু হয়। তাঁর সময়ের রেওয়াজ অনুসারে তিনি প্রথমে কলাপাতায়, পরে তালপাতায় এবং আরো পরে শ্লেটে লেখার অনুশীলন করেন। এই স্কুল থেকেই তিনি নিম্নপ্রাইমারির পরীক্ষায় সরকারি বৃত্তি লাভ করেন।

তিনি শৈশব থেকেই লেখাপড়ায় অতিশয় মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এ সময় সমগ্র দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কাজী দীন মুহম্মদও তার শিকারে পরিণত হন এবং বহুদিন পর্যন্ত তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিকটবর্তী মুড়াপাড়া

উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর আগ্রহে ও পিতার ইচ্ছায় তাঁর মাতুলালয় শরীয়তগঞ্জের নিকটবর্তী মাছিমপুর জুনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি জুনিয়র পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে হাজী মুহম্মদ মুহসিনের প্রদত্ত 'মুসলিম শিক্ষা তহবিল' থেকে সমগ্র বাংলা ও আসামে মুসলিম শিক্ষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে খান বাহাদুর আবু নসর ওয়াহিদ, নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব আবদুল লতিফ চৌধুরী, খান বাহাদুর মুসা প্রমুখ মুসলিম মনীষীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় রিফর্মড স্কিম বা নিউ স্কিম নামে একটি শিক্ষাধারার প্রচলন হয়। এই ধারায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং হুগলীতে প্রথম শ্রেণি থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস পর্যন্ত পাঠদানের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বাংলা ও আসামের প্রায় সর্বত্রই এই স্কিমের জুনিয়র ও সিনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা ও আসামের মুসলিম সমাজের কাছে ইংরেজি শিক্ষার দুয়ার খুলে যায় এবং প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পায়।

এদিকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ হয়ে আসাম ও বাংলাদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ছয় বছরের মাথায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। নানা মনীষীর ঐকান্তিক চেষ্টায় এই অঞ্চলের লোকদের বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এবং এ অঞ্চলের পশ্চাদপদ মুসলিমদের শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গে ঢাকা শহরের সকল স্কুল কলেজ এবং সমগ্র পূর্ব বাংলা ও আসামের সকল নিউ স্কিম সিনিয়র মাদরাসার পরীক্ষানিয়ন্ত্রণের জন্য ঢাকা শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হয়।

কাজী দীন মুহম্মদ ১৯৪২ সালে এই ঢাকা বোর্ডের মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। বিভিন্ন কারণে তিনি ঢাকায় লেখাপড়া না করে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৪৫ সালে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন।

তিনি ১৯৪৮ সালে বাংলায় অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর বৃত্তি লাভ করেন। স্মর্তব্য যে, সে বছর কেউ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়নি। এরপর তিনি এমএ শেষবর্ষে ভর্তি হন। নানা কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে ১৯৫০ সালে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ

পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পিএইচডি গবেষণার জন্য পোস্টগ্র্যাজুয়েট বৃত্তি লাভ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তিনিই দ্বিতীয় মুসলিম ছাত্র, যিনি বাংলা বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। এর আগে এই বিভাগে প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই প্রথম এই বিরল সাফল্যের অধিকারী হন।

কাজী দীন মুহম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যয়নকালে বাংলা ভাষার যেসব পণ্ডিতকে শিক্ষক হিসাবে পান তন্মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্রী গণেশচন্দ্র বসু, শ্রী সুশীল কুমার দে, মনমোহন ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

লেখালেখি

কাজী দীন মুহম্মদ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়েন তখন স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এরপর একই ম্যাগাজিনে পর পর আরও দুটি ইস্যুতে তাঁর দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। পরে কলেজে উঠে সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদীতে লেখা শুরু করেন। এ-সময় দৈনিক আজাদে 'জঞ্জাল' নামে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। এ গল্পে নায়ক অনেক লোকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে পরে নিজে মারা যায়।

দৈনিক আজাদে তাঁর এ গল্প মুদ্রিত হওয়ার পর লেখালেখির প্রতি তাঁর আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে যায়। এ সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষত আজাদ ও মোহাম্মদীতে তাঁর অনেক গল্প ও কবিতা ছাপা হয়। গল্প ও কবিতায়ও তাঁর ভাল হাত ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও গল্পগ্রন্থ ছাপাও হয়। কিন্তু তিনি শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় ও সতীর্থ বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে তুলনামূলকভাবে শ্রমসাপেক্ষ মাধ্যম প্রবন্ধসাহিত্যে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর অন্তত দশখানি মূল্যবান বইয়ের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। তার ভেতর গল্প-উপন্যাস ছিল, কবিতা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধও ছিল। তিনি একজন নিরলস সাহিত্যসেবক হিসাবে সারা জীবন সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

কর্মজীবন

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তিনি দুইমাস রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজে লিঙ্গুইজটিক্স এন্ড ফনিটিক্স বিভাগে ভর্তি হন এবং সেখানে তিন বছর অধ্যয়ন ও গবেষণার পর ভাষাতত্ত্বে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬১ সালের জুন মাসে লন্ডন থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। এক বছর পর তিনি রিডার পদে উন্নীত হন এবং ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই পদে কর্মরত থাকেন।

১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে উন্নয়ন অফিসার পদে কাজ করেন। ১৯৬৫ সালে পুনরায় বাংলা বিভাগে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালক (বর্তমানে মহাপরিচালক) পদে কর্মরত থাকেন।

এরপর পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে তিনি ১৯৭৮ সালে বাংলা বিভাগের প্রফেসর পদে উন্নীত হন। এ সময় থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন।

কাজী দীন মুহম্মদ ১৯৮৭ সালে প্রফেসর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন এবং এ তারিখ থেকে প্রফেসর পদে পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পাঁচ বছর পর তিনি সংখ্যাতিরিক্ত প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই ঢাকার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি কিছুদিন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বও পালন করেন।

দায়িত্ব

শিক্ষানুরাগী এই কর্মীপুরুষ আজীবন শিক্ষাবিষয়ক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জীবনের শেষসময় পর্যন্ত তিনি ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ আদর্শ শিক্ষা ভবনের রেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি কলেজ অব এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (সেডস)-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সভাপতি এবং ইসলাম প্রচার সমিতি ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে গেছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের পাঠ্যক্রম কমিটির সদস্য হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ও লাহোরের লিঙ্গুইজটিক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জীবন সদস্য ছিলেন।

তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আর্ট ইনস্টিটিউট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা পরিষদের সদস্য হিসেবে অবদান রাখেন। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘদিন দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড–ঢাকা, রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লার সদস্য ছিলেন।

কলাবাগান

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ঢাকা শহরের ১২৯ কলাবাগানের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। তিনি বাড়ি করার সময় নীল আকাশের নিচে উন্মুক্ত খোলা জমিতে ছায়া সৃষ্টির জন্য প্রায় এক হাজার কলাগাছ রোপণ করেন, যা ছয় মাসের মধ্যে বিরাট কলাবাগানে পরিণত হয়। ফলে বর্তমান নিউমার্কেট থেকে মিরপুর পর্যন্ত তাকালে এই কলাবাগান ছাড়া কিছুই চোখে পড়তো না। তাঁর এ বাড়ির লাগোয়া পশ্চিম পাশ দিয়ে তখন সবেমাত্র নতুন সড়ক চালু হয়, বর্তমানে যা মিরপুর রোড নামে পরিচিত। নতুন সড়কে রিকশা ও বাস চলাচল করতে শুরু করে। কোনো যাত্রী এ এলাকায় নামতে চাইলে রিকশাওয়ালা ও বাসের হেলপাররা জানতে চাইতো– কলাবাগানের এই পাশে, না ওই পাশে? ধীরে ধীরে তাঁর এ বাড়িকে কেন্দ্র করেই আজকের রাজধানী ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কলাবাগানের নামকরণ হয়।

কাজী দীন মুহম্মদ
বিশ্বাসী কীর্তিমান মনীষী ও তাঁর ইসলামী সাহিত্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন একজন উচ্চস্তরের শিক্ষাবিদ। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ইতিহাসবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁর পর্যায়ের ধ্বনিবিজ্ঞানী ও ভাষাতত্ত্ববিদ পৃথিবীজুড়ে ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন। তাঁর এসব পরিচয় আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অন্য একটি কারণে। তা হল, তিনি ছিলেন ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী, একজন খাঁটি মর্দে মুমিন। এজন্য এত বড় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী কারো কাছেই তিনি উপযুক্ত কদর পাননি। আসলে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর তুচ্ছ সম্মান তিনি কামনাও করেননি। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আফসোসও তাঁর মাঝে ছিল না। তিনি যা চেয়েছেন, তা পেয়েছেন।

তিনি জীবনের শেষদিকে বহুবার বলেছেন, আমার জন্য একটাই দোয়া করুন- আল্লাহপাক যেন আমার প্রতি রাজিখুশি থাকেন এবং আমার পরকালের জীবন যেন শান্তিময় হয়। মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে অসুখে পড়ে একদিন তিনি বলেছেন, 'আমার জন্য শুধু দোয়া করবেন হায়াতে তাইয়েবা ও রেজায়ে মাওলার।' হাদিস ও কুরআনের ভাষ্যমতে বুঝা যায়, তিনি হয়তো রেজায়ে মাওলা লাভ করেছেন। কারণ আল্লাহপাক যার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকেই ইবাদত-বন্দেগি করার সুযোগ দান করেন। তিনি সারা জীবন, বিশেষত জীবনের শেষসময়ে প্রচুর পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগি করেছেন।

তাঁর ন্যায় জাতীয় পর্যায়ের পণ্ডিত ও মনীষী মারা গেলে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সম্মান দেখানো কর্তব্য, আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তা প্রদর্শন করেননি। তাঁর পরশে ধন্য বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিক্ষাবোর্ড, আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তা করেনি। এমনকি, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভকারী শত শত ছাত্র, যারা এখন ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত, তারাও তাঁর প্রতি শেষশ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হননি এবং তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেননি। মূলত এদের কাছ থেকে তিনি সম্মান আদৌ কামনা করেননি। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তাঁর সম্পর্ক ছিল ধর্মপ্রাণ লোকদের সঙ্গে। তাঁরা দীন মুহম্মদ সাহেবের জানাযা ও দাফনকার্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর জন্য অনেক দোয়া করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, শত শত মর্যাদাবান ফেরেশতা

তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর সম্মানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রার্থনায় হয়তো তিনি কবরজীবনে শান্তিতে আছেন। আশা করি, আল্লাহপাক তাঁর সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবেন।

কাজী দীন মুহম্মদ পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে আলেমপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাই জন্মসূত্রেই তিনি নিজধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার শিক্ষা পান। তাঁর পিতার নাম কাজী আলীম উদ্দীন এবং দাদা মাওলানা কাজী গোলাম হোসাইন। তাঁর দাদা ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম। কাজী দীন মুহম্মদের মাতার নাম মুসাম্মত কাওসার বেগম। তাঁর নানা হলেন সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত পীর মাওলানা শরাফতুল্লাহ চিশতী রহ.।

তিনি অতি শৈশবেই মায়ের কাছে আলিফ-বা-তা-এর শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তিনি মায়ের কাছে সুরা ফাতিহাসহ কুরআন মজিদের শেষের দিকের ছোট ছোট অনেক সুরা এবং নামাযের প্রয়োজনীয় দোয়া-কালাম ইত্যাদি মুখস্থ করে ফেলেন। তাঁর মা-ই তাঁকে নামায-রোযার নিয়ম শিক্ষা দেন। এর পাশাপাশি নামায-রোযার গুরুত্বও তিনি বুঝান। এর ফলেই কাজী দীন মুহম্মদ চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ে যত্নবান ছিলেন। যে বছর তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েন সে বছর রমযান শরিফে তিনটি রোযা রাখেন। এর পরের বছর পুরো তিরিশটিই রাখেন। সেই যে তিরিশ রোযা রাখা শুরু করেন, জীবনের শেষবছর পর্যন্ত কখনো এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি যেখানে যে অবস্থায়ই ছিলেন, এমনকি প্রতিকূল পরিবেশেও, সালাত-সিয়াম কখনো তরক করেননি।

তিনি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কবি নজরুল সরকারি কলেজ) সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কলেজের নিকটবর্তী কলতাবাজার মহল্লায় স্কুল সেকশনের ছাত্রদের হোস্টেল ছিল। এ হোস্টেলেই তিনি থাকতেন। হোস্টেলের নিকটবর্তী মসজিদে প্রতিদিন জামায়াতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। এখানে থাকা অবস্থায় এক রাতে হোস্টেলে পুরস্কার বিতরণী ও ড্রামা হয়। শুতে বারোটা বেজে যায়। পরেরদিন সূর্য ওঠার পর তাঁর ঘুম ভাঙে। ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বন্ধুরা এত কান্নাকাটি করার কারণ জানতে পীড়াপীড়ি করলেও তিনি প্রকৃত কথা বলেননি। শৈশব থেকেই তিনি রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস করেন। ফজরের সময় হলেই তাঁর আম্মা তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। এ অভ্যাস তিনি আজীবন লালন করেছেন।

মরহুম কাজী দীন মুহম্মদের বয়স যখন নয় বছর শুরু হয় তখনই তাঁর পিতার ইনতেকাল হয়। এরপর তিনি মায়ের স্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হন। দীনদার ও তাহাজ্জুদগুজার মায়ের আদেশ-উপদেশ ও সুশিক্ষাই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়।

কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন অতিমাত্রায় মাতৃভক্ত। জীবনের যাবতীয় কাজ তিনি মায়ের পরামর্শ অনুযায়ী করতেন। তিনি 'আমার জীবনে মায়ের অবদান' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। এ প্রবন্ধে তাঁর মায়ের উপদেশ কীভাবে তাঁকে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে গেছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। প্রবন্ধখানি সুখপাঠ্য–পড়লে হৃদয় বিগলিত হয়। শুরুর দিকে তিনি লিখেছেন, 'আমার মা জীবনের সকল পার্থিব সুখ ত্যাগ করে তাঁর সবকিছু উজাড় করে আমাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি অধম। তাই তাঁর ত্যাগের সবটুকুর সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। কারণ তিনি যা চেয়েছিলেন, তা কি হতে পেরেছি? তিনি তাঁর সন্তানকে যেখানে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, তা কি দেখে গেছেন? তবে এ কথা স্বীকার করি, জীবনে যেটুকু হতে পেরেছি, যে যৎসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছি তার সবটুকুই আমার মায়ের প্রাপ্য।'

প্রবন্ধটির একেবারে শেষে লিখিত হয়েছে, 'ছাত্রজীবন পেরিয়ে সংসার-জীবনে প্রবেশ করার পরও একের পর এক হিমালয়ের মতো বিশাল তুফানের ঝাপটা এসে আমার জীবনতরী ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চেয়েছে। তখনো আমার মা নির্ভীক নাবিকের মতো হাল ধরে এ অসহায় যাত্রীকে অকূল পাথার থেকে উদ্ধারের প্রয়াসে তাওহিদী অঙ্গুলি নির্দেশে কূলের সন্ধান দিয়েছেন। বিয়াবান মরু সাহারায় যখন একাকী পথহারা পথিকের মতো নিরাশ হয়ে জীবনের আশার ক্ষীণ আলোর রাশ্মিটুকুও দেখতে পাইনি, সেই অতি কঠিন দুঃসময়ে আমার মহীয়সী মা ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে দিয়েছেন, ওই তো আলো। 'নিরাশ হয়ো না রে দরগাহে আল্লাহর। আল্লাহর নিরানব্বই মায়া থাকে উপরে বান্দার।'

দেশকে ভালোবেসে দেশের দুশমন হয়েছি, পল্লী জননীকে ভালোবেসে প্রতারিত হয়েছি, মানুষকে ভালোবেসে আঘাত পেয়েছি, কিন্তু মাকে ভালোবেসে সব ভুলে গেছি। তাঁর করুণাধারা আমাকে শাণিত করেছে ইস্পাতকঠোর, আমার চরিত্রে এনে দিয়েছে হিমালয়ের সাহস। আজ তিনি নেই, কিন্তু তিনি সব সময় আমাকে আগলে রেখেছেন। বোধ করি, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মহিমময় শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে তিনি কাছে টেনে নিবেন।'

কাজী দীন মুহম্মদ মরহুমের এ প্রবন্ধ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। বিশিষ্ট কবি ও গদ্যশিল্পী প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান 'কাজী দীন মুহম্মদের পরিচয়' নামক প্রবন্ধে ২০০৪ সনে লিখেছেন, 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পত্রিকা অগ্রপথিক একবার একটি আলোচনা প্রবর্তন করেছিল। দেশের কিছু সংখ্যক সম্মানিত ব্যক্তিকে তাঁদের মাতা সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে বলা হয়েছিল। অনেকের লেখাই এতে ছিল। কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম দীন মুহম্মদের প্রতিবেদনে। গল্পের মতো সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গিতে মাতার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুভূতি তিনি

প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর শৈশবের অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, চিরকাল মাতার আদেশ ছিল তাঁর জন্য শিরোধার্য। এ প্রবন্ধ পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কাছে পেয়ে একদিন বলেছিলাম, তোমার মাতার প্রতি যে অনুভূতি তুমি প্রকাশ করেছো তা সত্যি আমাকে অভিভূত করেছে।'

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখন এখানে তিনি শ্রী সুশীল কুমার দে, শ্রী গণেশচন্দ্র বসু, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ মনীষী ও পণ্ডিতকে শিক্ষক হিসেবে পান। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পণ্ডিত হওয়ার পাশাপাশি ধর্মপরায়ণও ছিলেন। ছাত্র কাজী দীন মুহম্মদের লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ এবং পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দীন মুহম্মদকে অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। এমনকি, সহপাঠীরা তাঁকে ডক্টর শহীদুল্লাহর নাতনি জামাই বলেও ঠাট্টা করত।

কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে মরহুম মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ফলেই কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহই তাঁকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করার অনুপ্রেরণা দান করেন।

ভাষাতত্ত্বের তিনটি ধারা রয়েছে। প্রথমত বর্ণনামূলক ধারা। একে আধুনিক ভাষাতত্ত্বও বলা হয়। দ্বিতীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং তৃতীয়ত ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব। কাজী দীন মুহম্মদই প্রথম ব্যক্তি, যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লিঙ্গুইজটিক্স এন্ড ফনিটিক্স বিভাগে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে বাংলা ভাষার ক্রিয়ারূপ নিয়ে গবেষণা করে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। এর পূর্বে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উভয়েই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে গবেষণা করে ডিগ্রি অর্জন করেন।

কাজী দীন মুহম্মদ ১৯৬১ সালে লন্ডন থেকে ডক্টরেট লাভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পুনরায় যোগদান করেন। এখানে তিনি প্রায় বত্রিশ বছর যাবৎ শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর কিছুদিন তিনি ঢাকার দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বও পালন করেন।

এদেশের কওমী মাদরাসাগুলো বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও চিন্তাধারার প্রাণকেন্দ্র। এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কাজী দীন মুহম্মদ ভাবতেন এবং অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। তিনি অনেক কওমী মাদরাসার সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন।

বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও চিন্তাধারার অধিকারী কাজী দীন মুহম্মদ আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানকেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন।

এই মহান শিক্ষাবিদ বহুবার বলেছেন, ঢাকার নন্দিপাড়ায় তাঁর কয়েক বিঘা জমি আছে। সেখানে তিনি একটি কওমী মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ করবেন। তিনি জীবদ্দশায় তা দেখে যেতে পারেননি। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁর এ স্বপ্ন পূরণ করবেন কি না, আমার জানা নেই।

শিক্ষানুরাগী এই কর্মবীর ও ইসলামী চিন্তাবিদ ১৯২৭ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার রূপসী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ২৮ অক্টোবর ২০১১ জুমআবার দিবাগত রাত পৌনে বারোটায় ইনতেকাল করেন। পরদিন বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রূপসীর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং সকলে তাঁরই কাছে ফিরে যাব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করুন এবং ইহকাল ও পরকালে শান্তি দান করুন।

কাজী দীন মুহম্মদ সাহিত্যের নানা শাখায় কাজ করলেও ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও গ্রন্থপ্রণয়নে জীবনের অনেক বড় অংশ ব্যয় করেছেন। তিনি ইসলামী সাহিত্যের যে বিশাল ভাণ্ডার গড়ে দিয়ে গেছেন, সমকালে তার তুলনা বিরল। তিনি প্রতিটি লেখাই প্রচুর পরিশ্রমের মাধ্যমে তৈরি করেছেন। তাঁর রচনার প্রতিটি বাক্যই আঁটসাঁট, সুদৃঢ় ও সুগ্রন্থিত।

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের গদ্যের ন্যায় তাঁর গদ্য প্রকৃষ্ট বন্ধনে সমৃদ্ধ। তিনি এক অনন্যসাধারণ গদ্যশৈলীর রূপকার। যেহেতু তিনি ধ্বনিবিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন; তাই তাঁর সুগঠিত বাক্যের প্রতিটি শব্দই ধ্বনিতত্ত্বের আওতায় সংযোজিত হয়েছে। এজন্যই তিনি একজন মহত্তম গদ্যশিল্পী ও প্রাবন্ধিক।

তাঁর রচিত ইসলামবিষয়ক কিছু গ্রন্থের নাম প্রকাশকালসহ এখানে উল্লেখ করা হল : মানবমর্যাদা, ১৯৬০; সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, ১৯৬৯; সূফীবাদের গোড়ার কথা, ১৯৮০; মানবজীবন, ১৯৮০; জীবনসৌন্দর্য, ১৯৮১; প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা, ১৯৮২; শিক্ষা, ১৯৮৯; ইসলামী সংস্কৃতি, ১৯৮৯; বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব, ১৯৯০; বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৯৯১; জুমুআর ঘরে, ১৯৯১; নাস্তিকতা ও আস্তিকতা, ১৯৯৩; আমি তো দিয়েছি তোমাকে কাউসার, ১৯৯৩; মহানবীর বাণী শতক, ১৯৯৮; বিধান তো আল্লাহরই, ১৯৯৯; ছোটদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা), ১৯৯৯; বিসমিল্লাহর তাৎপর্য, ২০০০ ইত্যাদি।

প্রজ্ঞাবান মনীষী কাজী দীন মুহম্মদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত আলকুরআনুল কারীম, বুখারী শরিফ, মুসলিম শরিফ, তিরমিযী শরিফ, আবু দাউদ শরিফ, মুওয়াত্তা, হেদায়া, আলমগীরী এবং ফাতাওয়া ও মাসাইল ইত্যাদি গ্রন্থের সম্পাদনার জন্য গঠিত বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

বোর্ডের প্রবীণ আলেম সদস্যদের সঙ্গে বসে প্রধানত তিনি ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের উপযোগিতা এবং মর্ম ব্যক্ত করায় শব্দের ভূমিকা নিয়ে কাজ করতেন।

মরহুম কাজী দীন মুহম্মদের ইসলামের নানা দিক নিয়ে লেখা উন্নতমানের চিন্তামূলক ও গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত মাসিক অগ্রপথিক, ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অধুনালুপ্ত ঐতিহ্য ও সীরাত স্মরণিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এগুলো গ্রন্থিত হওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করলে তাদের দ্বারা কখনো কখনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে কাজী সাহেব ছিলেন ব্যতিক্রম। এর অন্যতম কারণ হল, এ দেশের হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে তিনি পরামর্শ ও মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়েছেন। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ খান, হযরত হাফেজ্জী হুজুর, বায়তুল মোকাররমের ভূতপূর্ব খতীব মাওলানা মুফতী আবদুল মুঈজ, আজিমপুরের মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতীব মাওলানা উবায়দুল হক, মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মালিবাগের মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, মরহুম মাওলানা ইসহাক ফরিদী প্রমুখের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

কাজী দীন মুহম্মদ অনেক আলেমের ব্যক্তিত্ব, দীনী খেদমত ও অবদান নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখেছেন। তন্মধ্যে যশোরের মুনশী মেহেরুল্লাহ, নোয়াখালীর মাওলানা মুসতাফীজুর রহমান, হযরত হাফেজ্জী হুজুর, হযরত মাওলানা উবায়দুল হক ও চরমোনাইর মরহুম মাওলানা ফজলুল করীমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের দরসে বুখারী শরীফের পঞ্চাশ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকে হযরতের অবদান নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর এসব দীনী খেদমত কবুল করুন। আমীন।

তোমার আদর্শ আজ কর্মের প্রেরণা নিয়ে
সহস্রের শপথে বাঙ্ময়।

কাজী দীন মুহম্মদের ভাষাজ্ঞান

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি উনিশ শ সাতান্ন সালের শেষের দিকে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজে লিঙ্গুইজটিক্স এন্ড ফনিটিক্স বিভাগে ভর্তি হন। এবং সেখানে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তিন বছর অধ্যয়ন ও গবেষণার পর আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, বাংলা ভাষার ক্রিয়ারূপের ধ্বনি সংগঠন। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদের রূপভেদ বর্ণনায় তাঁর এ অভিসন্দর্ভ বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ।

হয়তো ভাষাতত্ত্বে গবেষণার ফলেই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হাজার হাজার শব্দ নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। এজন্য বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ বিশেষত বিদেশি শব্দের মূল, জন্ম, জন্মভূমি, পূর্ববর্তী ভাষায় থাকা অবস্থায় চলিত অর্থ, বাংলায় আগমনের সম্ভাব্য সময়কাল, বাংলা ভাষায় আগমনের পর বিকৃত অথবা পরিবর্তিত উচ্চারণ ও অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এক কথায়, বাংলায় ব্যবহৃত হাজার হাজার শব্দের গূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যময় তথ্য তাঁর নখদর্পণে। তিনি এ বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারতেন। যেন এগুলো তাঁর গল্পের মতো মুখস্থ।

যেসব বিদেশি শব্দ পূর্ববর্তী ভাষায় থাকাকালে ইসলামী আকিদার সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ অর্থ বহন করত, সে শব্দগুলিকে তিনি বাংলায় প্রচলিত হওয়ার পরও পরিহার করতেন। এ ধরনের একটি শব্দ 'উদ্‌বোধন'। আরবি 'ইফতিতাহ'-এর স্থলে এ শব্দ প্রয়োগ করা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, উদ্‌বোধন শব্দের প্রকৃত অর্থ, দুর্গাপূজার পূর্বমুহূর্তে দেবীর জাগরণ-নিমিত্ত ক্রিয়াবিশেষ। পূজারিগণ পূজার প্রাক্কালে ঘণ্টা বাজিয়ে দেবীর বোধ বা চেতনা সঞ্চার করে। এ বোধসম্পাদন বা জাগরণকেই তারা উদবোধন বলে। কোন মুসলিম এরূপ কাজ করে না, এ বিশ্বাসও পোষণ করে না। এহেন শিরকি বিশ্বাস-সঞ্জাত শব্দও মুসলমানের পক্ষে ব্যবহার করা অবিধেয়।

আরেকটি শব্দ 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'। এর অর্থ যুক্তকরদ্বয় চিৎ করে দেবীর পাদপদ্মে পানি দেওয়া। এ শব্দে এখন মূল অর্থ অবশিষ্ট না থাকলেও মূল অর্থের গন্ধ রয়ে গেছে। এর সঙ্গে আরও একটি শব্দের আলোচনা করতে হয়। তা হল, 'গণ্ডূষ'। ভাষাবিদ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস অঞ্জলির অর্থ লিখেছেন : যুক্তকরদ্বয় চিৎ

করিয়া গণ্ডূষের ন্যায় গঠিত আকারবিশেষ। গণ্ডূষের প্রচলিত অর্থ আমরা জানি, হাতের কোষ। অথচ মূল অর্থ, হিন্দুশাস্ত্রমতে ভোজনের প্রথমে ও শেষে মন্ত্র পাঠপূর্বক মুখে যে জল গ্রহণ করা হয় তা।

কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, অতিথি শব্দটি আরবি জাইফ বা ফারসি মেহমানের বাংলা প্রতিশব্দ হয় না। কারণ ইসলামী বিধানমতে আগন্তুক সর্বনিম্ন তিন দিন পর্যন্ত জাইফ বা মেহমানের সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথচ অতিথি অর্থ, যে এক তিথিকাল অবস্থান করে না। এক চান্দ্রদিনে বা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় এক তিথি হয়। অভিধানে অতিথির অর্থ লেখা আছে, গৃহস্থের গৃহে এক রাত্রের অধিক যার স্থিতি নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আগন্তুককে কমপক্ষে তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারি করা হবে। কমপক্ষে তিন দিন পর্যন্ত তিনি মেহমান। 'অতিথি' শব্দে কি এ অর্থ পাওয়া যায়?

কাজী দীন মুহম্মদ বলেছেন, 'ফি' শব্দটি ইংরেজি fee শব্দ থেকে আমাদের ভাষায় এসেছে। ইংরেজি ভাষায় প্রাচীনকালে fee কথাটির অর্থ ছিল অশ্ব বা ঘোড়া। এ কথা আমাদের জানা যে, কোনো কিছু কেনাবেচার জন্য যেমন টাকার প্রচলন আছে, বহুদিন আগে এমনটি ছিল না। তখনকার দিনে মানুষ কোনো জিনিসের বিনিময়ে অন্য কোনো জিনিস নিত। যেমন, আমার ঘোড়া আছে আর আপনার ধান আছে। আমার ধানের দরকার আর আপনার দরকার ঘোড়ার। আমরা উভয়ে উভয়ের জিনিসের বিনিময় করলাম। তাহলে দাঁড়াল এই, আপনার বস্তুর মূল্য ঘোড়া বা fee। পরে এ বিনিময়ের মাধ্যম গরু, মেষ ও অন্যান্য পশুও fee বলে চালু হল। আরও পরে যখন ঘোড়া বা অন্যান্য পশুর বদলে টাকাই হল বিনিময়-মাধ্যম, তখনও দেয় অর্থ বা বিনিময়ের মাধ্যমকে fee বলা হল। এখন উকিলের পারিশ্রমিক, ডাক্তারের দর্শনী, স্কুল-কলেজের বেতন, সম্মেলনের প্রবেশমূল্য, মাশুল, কর ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে আমরা fee কথাটি ব্যবহার করি। পরীক্ষার ফি, কোর্ট-ফি, রেজিস্ট্রেশন-ফি এখন নিত্যব্যবহৃত সাধারণ শব্দ।

এমনিতর অপর ভাষা থেকে আগত একটি শব্দ 'আপা'। শব্দটি বড় বোন, বয়োজ্যেষ্ঠ পরিচিত ও অপরিচিত মহিলা, শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষিকা অর্থে এবং তাঁদের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়।

আগের দিনে, মুসলিম মহিলাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার অভাব ছিল। আর শিক্ষায়তনে মুসলিম শিক্ষিকা ছিলেন না বললেই চলে। শিক্ষয়িত্রী ছিলেন হিন্দু মহিলা। স্কুল ও কলেজে শিক্ষয়িত্রীকে ম্যাডাম ও দিদি বলা হতো। পরে বৃটিশ-বিদ্বেষের কারণে ম্যাডামও উঠে যায়। কেবল 'দিদি' থাকে। দিদিমণিও বলা হতো। হিন্দুদের বাড়িতেও দিদি ও দিদিমণি ছিল। মুসলিমদের বাড়িতে বুবু ও বুবুজান সংক্ষেপে বুজান, বুয়া বা বু শব্দটি বড় বোনের সম্বোধনে ব্যবহৃত হতো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহু উর্দু ভাষাভাষী মুসলিম ভারতের উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার ও অন্যান্য এলাকা থেকে এসে পূর্বপাকিস্তানে অধিবাসিত হয়। আর সে সঙ্গে বুবু, বুয়া ও দিদি শব্দকে সরিয়ে 'আপা' তার স্থান দখল করে নেয়। কারো কারো ধারণা, শব্দটি উর্দু ভাষা থেকে আগত। কথাটি ঠিক নয়। আপা শব্দ যেমন বাংলা ভাষায়, তেমনি উর্দু ভাষায় কৃত ঋণ শব্দ। পণ্ডিতদের অনেকেই মনে করেন, শব্দটি মহারাষ্ট্রীয় ভাষার। আবার কারো মতে এটি তুর্কি ভাষা থেকে এসেছে।

'আপা' শব্দটি আগে থেকেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচলিত ছিল। আর উচ্চ কোটির প্রয়োগপ্রাধান্যে এর আভিজাত্যও বেড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সে কারণেই পাকিস্তানিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটি এসে আমাদের ভাষায় এবং আমাদের পরিবারে পাকাপোক্তভাবে স্থান করে নিয়েছে। ব্যবহারিক আভিজাত্যের কারণে আটপৌরে বুবু, বুবুজান, বুজান, বুবুজি, বুজি, বুয়া ও বু গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট ও অচল হয়ে পড়েছে। নিজস্ব এ শব্দগুলো একান্ত ঘরের বলে অবজ্ঞা, অনীহা ও অপভাবের শিকার হয়েছে। আপা এখন আমাদের নিজস্ব শব্দ। যেমন আরবি 'সিরওয়ালা' ও 'কামিস' ফারসিতে এসে হয় শেলওয়ার কামিস। ফারসি থেকে আসে উর্দুতে। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ঘরে ঘরে সেলোয়ার কামিজ সমাদৃত হয়।

পবিত্র কুরআনের সুরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামাকে কামিজ বলা হয়েছে। মৃতব্যক্তিকে কাফন দেওয়ার সময় পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি ও নারীর ক্ষেত্রে পাঁচটি কাপড় পরিধান করাতে হয়। তন্মধ্যে জামার ন্যায় যে কাপড়টি পরানো হয়, তাকে কামিজ বলে। হাদিস শরিফে ও ফিকহি গ্রন্থাবলিতে মৃত নারীপুরুষ উভয়ের এ জামাকেই কামিজ বলা হয়েছে। কুরআন-হাদিসে, আরবি-ফারসি ও উর্দু ভাষায়, এমনকি বাংলা অভিধানেও নারীপুরুষ উভয়ের কোর্তার ক্ষেত্রে কামিজ শব্দ প্রয়োগ হয়েছে। শুধু বাংলাদেশের কথ্য ভাষায় মেয়েদের জামার জন্য কামিজ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

বাংলা ভাষায় নানা শব্দটি মহারাষ্ট্রীয় ভাষা থেকে এসেছে। আমাদের ভাষায় এর অর্থ মাতার পিতা—মাতামহ। মহারাষ্ট্রীয় উপভাষায় এটি পিতা অর্থে ব্যবহৃত হতো। তেমনি আরেকটি শব্দ 'বাবা'। শব্দটি তুর্কি ভাষা থেকে এসেছে। তুর্কি ভাষায় এর অর্থ বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়োবৃদ্ধ, বুযুর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তি। আমাদের ভাষায় এসে পিতা, অপত্য পুত্র বা পুত্রবৎ, স্নেহবৎসল এবং পীর-মুরশিদ এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের সমাজে আত্মীয় সম্পর্কের দুটি শব্দ আছে, যাদেরকে পরমাত্মীয় বলা হয়। শব্দ-দুটি হল, শালা ও সম্বন্ধী। শালা সংস্কৃত শ্যালক শব্দজাত। এর অর্থ স্ত্রীর ভাই। অপর অর্থ গালি। গালি এর দূরবর্তী আরোপিত অর্থ। এ শব্দটি

হিন্দি ও উর্দু ভাষায়ও এ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দি, উর্দু ও বাংলা অভিধানে এর অর্থ স্ত্রীর ভাই করা হলেও বাংলাদেশে স্ত্রীর ছোট ভাই অর্থে প্রচলিত। 'সম্বন্ধী' মানে সম্বন্ধযুক্ত। আরেক অর্থ স্ত্রীর বড় ভাই, জ্যেষ্ঠ শ্যালক। এ শব্দটি পাঞ্জাবি ভাষায় ব্যবহৃত হয় শ্বশুর অর্থে। বাংলায় কীভাবে স্ত্রীর বড় ভাই হিসাবে এসেছে বলা যায় না। তবে শালা ও সম্বন্ধী সম্বোধন করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। শুধু পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়, অমুক আমার শালা বা সম্বন্ধী। তেমনি সম্বোধনে ব্যবহৃত হয় না পিতা, মাতা, শ্বশুর ও শাশুড়ি।

আরেকটি শব্দ বেহাই বা বিয়াই। মানে, পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। এ নামে পরিচয়ও দেওয়া হয়, ডাকাও হয়। সংস্কৃত বিবাহিত থেকে এ শব্দটি এসেছে। বোনের দেবর বা ভাসুরকে এবং ভাইয়ের শালা বা সম্বন্ধীকেও কোনো কোনো অঞ্চলে বিয়াই বলা হয়। এরূপ বিয়াইকে কুমিল্লা অঞ্চলে বলা হয় তালাতো ভাই। তালইয়ের ছেলেকে বিয়াই না বলে তালাতো ভাই বলাই সঙ্গত।

ভাষাবিজ্ঞানী কাজী দীন মুহম্মদ একদিন বলেন, শব্দের অর্থ না বুঝে শব্দের আকৃতি দেখে আনুমানিক অর্থ নির্ধারণ করে আমরা অনেক শব্দের বিভ্রান্তিমূলক প্রয়োগ করে থাকি। তেমনি একটি শব্দ 'লোকায়ত'। আমরা সর্বসাধারণের অর্থে 'লোক' শব্দের প্রয়োগে বিভ্রান্ত হই। বলি লোকজ সংস্কৃতি। যার অর্থ করি সাধারণ জনগণ থেকে উদ্ভূত যে সংস্কৃতি। এর পাশাপাশি বলি ও লিখি 'লোকায়ত'। অর্থ করি সাধারণ্যে প্রচলিত। কিন্তু শব্দটির অর্থ তা নয়। লোকায়ত অর্থ নাস্তিক, জড়বাদী, আত্মা পরলোক ইত্যাদি যে মানে না, যাতে ধর্মের জন্য পার্থক্য করা হয় না, Secular ইত্যাদি। এ শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ হলে অর্থ হবে নাস্তিক্য, জড়বাদ ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমার স্নেহভাজন ছাত্র আবুল কাসেম ফজলুল হক অত্যন্ত উঁচু মানের একটি সাময়িকী সম্পাদনা করেন, যার শিরোনাম লোকায়ত। এ নাম তিনি জেনে-বুঝেই দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের লোকসাহিত্যের বিখ্যাত গবেষক ও কবি কী মনে করে তাঁর একটি গ্রন্থের নাম 'লোকায়ত' রাখলেন বুঝা গেল না। কেননা বইয়ের ভেতরকার উপাদানে নাস্তিকতার কোনো গন্ধ নেই।

যৌনরোগ, যৌনকর্ম ও যৌনকর্মী—এ যুগল বা যুগ্ম শব্দগুলোর প্রথম অংশ যৌন, যা যোনি বা যোনী শব্দজাত। যার অর্থ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, Vargina। সুতরাং যৌন শব্দটির অর্থ যোনিসম্বন্ধীয়। ডাক্তারিশাস্ত্রে যৌনব্যাধি, যৌনরোগ ও যৌনরোগী—শব্দগুলি নারীপুরুষ নির্বিশেষ সবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পুরুষের জন্য কেন প্রয়োগ হয়ে আসছে, সে ব্যাকরণ ডাক্তার সাহেবরাই ভালো বলতে পারবেন। হালে সকল মিডিয়ায় দেদার ব্যবহার হচ্ছে যৌনকর্ম, যৌনকর্মী ও যৌনকর্মকাণ্ড ইত্যাদি শব্দ।

এও না হয় বরদাশত করা গেল। বাংলা শিল্প শব্দটির একটু শালীনতা আছে। শিল্প শব্দ যোগে যৌনশিল্প, যৌনশিল্পী এসব কথাও প্রচলনের প্রচেষ্টা চলছে। যারা এসব শব্দ ব্যবহার করছে তারা হয়তো পতিতা, কুলটা, ভ্রষ্টা ইত্যাদি বর্জন করে শালীন শ্লীল ও ভব্য শব্দ যৌনশিল্প এবং সে কর্মে নিয়োজিতদের জন্য যৌনশিল্পী শব্দ ব্যবহার করে তাদের কর্মের পরম সুন্দর স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে। এতে কি শিল্প শব্দটির সিমান্টিক পতন ঘটানো হল না? শিল্প শব্দের প্রয়োগ এ পর্যায়ে নামিয়ে আনলে কালক্রমে শব্দটির ভাবমর্যাদার অধঃপতন ঘটবে, সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় আগত একটি শব্দ 'সহসা'। এর অর্থ হঠাৎ, অকস্মাৎ। এ শব্দের প্রাচীন বাংলা রূপ সহসাৎ। 'সহসা'র প্রয়োগ পত্র-পত্রিকায় অন্যবিধ হয়ে উঠেছে। যেমন, 'আমার সহসা বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে নেই।' এ বাক্যে সহসা মানে কাছাকাছি কোনো সময়। প্রয়োগবাহুল্যে হয়তো একদিন এর আসল অর্থই গৌণ হয়ে পড়বে এবং অপপ্রয়োগের প্রাবল্যে নতুন অর্থ ভাষায় গৃহীতও হয়ে যেতে পারে।

'প্রিয়' শব্দের অর্থ ভালোবাসার পাত্র, যা ভালো লাগে, যা প্রীতিভাজন। সুদিন সুকৃতি ইত্যাদি শব্দের অনুসরণে প্রিয় শব্দের আগে 'সু' যোগ করে 'সুপ্রিয়' শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রিয় মানেই যথেষ্ট ভালোবাসার পাত্র। এতেই যথেষ্ট 'সু' রয়েছে। সুপ্রিয় চালাতে হলে 'কুপ্রিয়' বলে আরেকটি শব্দের কল্পনা করতে হয়। তদ্রূপ স্বাগত মানেই সু-আগত। এর মধ্যেই খোশ আমদেদ ও Welcome রয়েছে। তেমনিভাবে 'স্বাস্থ্য' শব্দের মধ্যেও 'সু' রয়েছে। স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যহীন কথাগুলো প্রচলিত আছে। অতএব 'সুস্বাগত' ও 'সুস্বাস্থ্য' বলার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে 'সু' শব্দের অপপ্রয়োগই শুধু হয়।

বাংলা ভাষার একটি শব্দ 'অভাব'। এর অর্থ অনটন, অর্থকষ্ট, অবিদ্যমানতা। শব্দটি বিশেষ্য। অভাবগ্রস্ত বা যার অভাব আছে তাকে কথ্য ভাষায় বা কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় অভাবী বলা হয়ে থাকে। এ স্থলে 'অভাব' শব্দের পর 'ঈ' যোগ করে 'অভাবী' গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ গঠন ব্যাকরণসম্মত নয়। আমরা বলি এবং কেউ কেউ লিখিও 'অভাবী মানুষের ভিড় জমেছে।' এরূপ বলা ও লেখা অসঙ্গত। অভাবী না বলে বলতে হবে অভাবগ্রস্ত।

কাজী দীন মুহম্মদ একবার বলেন, আমরা অনেক সময় শ্রুতি সুখকর মনে করে শব্দের আনুমানিক অর্থ নির্ধারণ করে কিছু শব্দের অপপ্রয়োগ করে থাকি। তেমনই একটি শব্দ 'বিদগ্ধ'। এর অর্থ রসজ্ঞ, বিদ্বান, চতুর, পণ্ডিত। তিনি বলেন, একদিন একজন বিশিষ্ট ভাষ্যকার টেলিভিশনের পর্দায় বলেন, 'সকলকে বিদগ্ধচিত্তে প্রার্থনা করতে হবে।' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিদগ্ধ

অর্থ বিশেষভাবে দগ্ধ বা পোড়া। বিদগ্ধ শব্দের এরূপ ব্যবহার শুধু অপপ্রয়োগই নয়; বরং হাস্যকরও।

এরূপ একটি শব্দ ফলজ। বনজ মানে বনে জন্মে যা, বনজাত। এর দেখাদেখি আমরা ফলবান বৃক্ষ বোঝাতে বলি, ফলজ গাছ। যা অবিধেয়। বরং হবে ফলদ। মানে ফলদাতা, ফলদায়ক, ফলদান করে যে, যেমন বলদ—যে বলদান করে।

কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর মিসরের এক ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছেন : প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন যে, 'পেপিরাস' থেকে পেপার মানে কাগজ তৈরি হয়েছে। মিসর বর্তমান সভ্যতার অন্যতমশ্রেষ্ঠ উপাদান কাগজ তৈরির এবং লেখার উপাদান হিসেবে কাগজের ব্যবহার আধুনিক বিশ্বকে শিক্ষা দিয়ে, সভ্যতাকে সহস্র বছরের অন্ধকার থেকে আলো ঝলমল দুনিয়ায় এনে স্থাপন করেছে। 'পেপিরাস' কাশজাতীয় উদ্ভিদ। আখ এবং কাশ একই শ্রেণির। আখ এবং কাশ এ দেশে এসেছে ফিনিসীয় বণিকদের মাধ্যমে। কারো কারো মতে, এ দুটো এসেছে জাভা ও সুমাত্রা এলাকা থেকে। আবার কেউ মনে করেন, এ দুটো এসেছে মিসর থেকে। ভারতের দাক্ষিণাত্যে প্রথমে আখের চাষ হয়। সম্ভবত বিদেশাগত বণিকদের মারফতেই দ্রাবিড়দের অভিবাসনের সময় প্রথমে এ দেশে আখ ও কাশ আসে।

কেউ কেউ মনে করেন, ভূমধ্যসাগরীয় ও লোহিতসাগরীয় এলাকায় আখের চাষ ছিল। মিসরবাসী প্রকৌশলীরা এ উদ্ভিদের রস থেকে প্রথমে চিনি বা মিষ্টি তৈরি করেন। সেখান থেকেই এসেছে বলে শর্করাকে আমরা মিসরি শর্করা বা 'মিসরি' বলি। আসলে কথাটি 'মিসরী শাক্কর'-বা মিসরের মিষ্টি। পরে আমাদের কাছে 'শাক্কর' বা 'শর্করা' শব্দটি, অতিশায়ন মনে হওয়ায় কেবল মিসরি শব্দই প্রয়োগ করি।

এখনো আমরা মিসরিই খাই। এটি জমাট বাঁধা চিনির রূপভেদ। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় 'চিনি' শব্দটি। এটিরও উদ্ভব মিসরির মতোই। চীন থেকে এ মিঠা বস্তুটি এসেছে বলে একে চিনী বা চিনি বলি। এটিও জাভা ও সুমাত্রা হয়ে এদেশে আসে। মিসরি শাক্কর কিংবা চিনি শাক্কর না বলে কেবল মিসরি ও চিনি বলেই চালিয়ে দিই। যেমন আমাদের বিশেষ জামাকে চালিয়ে দিই পাঞ্জাবি বলে। আসলে কথাটি ছিল পাঞ্জাবি কোর্তা বা পাঞ্জাবি পিরহান। পিরহান কথা বাদ দিয়ে কেবল পাঞ্জাবিই এখন বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন ডিজাইনে ব্যবহার করি।

কাজী দীন মুহম্মদ একদিন আমাকে বলেন, আপনাদের কুমিল্লায় একটি শব্দ প্রচলিত আছে 'আয়েম'। কথাটির অর্থ কি? আমি বলি, ভাগ্য, রাশি, কপাল, সময়। যেমন, বলা হয়, 'আমার আয়েমটাই খারাপ।' তিনি বলেন, এ শব্দটি আরবি আইয়্যাম থেকে এসেছে। অর্থ ঋতু, কাল, সময়, দিন। আবার এ শব্দটিকেই যশোর অঞ্চলে উপযুক্ত সময় বোঝাতে 'আয়াম' বলা হয়।